সবাই যা দেখে

উদ্দেশ্য যদি হয় কোচিং ও নোট-গাইড বাণিজ্য বহাল রাখা তবে সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক

আবদুল মান্নান খান

| ঢাকা , বুধবার, ২০ নভেম্বর ২০১৯

‘শিক্ষা আইনের খসড়া ফের পর্যালোচনায়। ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৯ বছরে শিক্ষা আইনের খসড়া বারবার সংযোজন-বিয়োজন হচ্ছে (দৈনিক সংবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯)’। পর্যালোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই কিন্তু সময়ক্ষেপণকে নয়। যত পর্যালোচনা করা হবে আইনটি ততই পরিশীলিত হবে, যুগোপযোগী হবে জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে। কিন্তু বছরের পর যদি শুধু খসড়ার পর্যালোচনা চলতে থাকে তাহলে তো বিপরীতটাই হতে থাকবে। কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হবে। কথাটা স্বতঃসিদ্ধ- শিক্ষাই জাতির মেরুদ-। মজবুত শিক্ষা আইন তো মজবুত শিক্ষা, মজবুত শিক্ষা তো মজবুত জাতি। কাজেই জগৎসংসারে অন্যতম প্রধান মৌলিক প্রয়োজন হলো শিক্ষা। এটা নিয়ে হেলাফেলা করে কোন দেশ-জাতি মেরুদ- সোজা করে চলতে পারে না পারবেও না।

৯ বছর ধরে শিক্ষা আইন বারবার পর্যালোচনা হচ্ছে। সময়ের এ দীর্ঘ ব্যবধান কেন তা যে কারও একেবারে বোধগম্য নয়, তা বলা যাবে না। পত্রিকাটি লিখেছে, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামত খুব একটা আমলে না নিয়ে বারবার এ আইনের খসড়া রিভিউ করা হচ্ছে'। এও লিখেছে 'ব্যবসায়ী ও কোচিং সেন্টার মালিকদের চাপে এটা বারবার পর্যালোচনায় যাচ্ছে বলে অভিযোগ আছে'। আর তাই যদি হয় তাহলে তো বলতেই হয় সময়ক্ষেপণও এখানে একটা বাণিজ্য। আরেকটা কথা এখানে এসে যায় তাহলো জবাবদিহির প্রশ্ন। সেটার অভাব থাকলে এমন হতেই পারে। আর যদি মনোভাব এমন হয় যে, কাজ চলছে তো। আরও ভালো কী করে করা যায় সেটা করতে তাড়াহুড়ো করলে চলবে কেন। এমন হলেও কোন কথা চলে না।

তবে বারবার পর্যালোচনা যদি কোচিং নোটগাইড ও সহায়ক গ্রন্থের বাণিজ্য যতদিন প্যারা যায় ধরে রাখার কৌশল হয় তবে সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক।

কিছুদিন খুব হৈচৈ হলো কোচিং সেন্টার থাকছে না নোট-গাইড থাকছে না সহায়ক গ্রন্থের নামে শিশুদের ওপর যেমন খুশি বই চাপিয়ে দেয়া যাবে না, এমন কি তারও কিছু আগে পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা থাকবে না। প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে এমন সব কথা অনেক হলো কিন্তু বাস্তবে তার কোনটাই কার্যকরী হলো না এখন পর্যন্ত। ব্যতিক্রম থাকতেই পারে সেটা বাদে স্কুল পর্যায়ে এমন কোন শিক্ষার্থী পাওয়া

যাবে না যে কোচিং করে না। আবার বলতে হয়, না করেইবা তারা পারবে কীভাবে। পারতে হলে তো কারিকুলাম সেভাবে হতে হবে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সেভাবে হতে হবে, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যেভাবে পড়াবেন শিখাবেন প্রশ্নপত্র সেভাবে হতে হবে তাহলে না একজন শিক্ষার্থী কোচিং নোট-গাইড ছাড়া লেখাপড়া করতে পারবে। আর সহায়ক বই-শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বড় সহায়ক আর কী হতে পারে। সহায়ক বই শিক্ষকদের দিলে সেভাবে ট্রেনিং দিয়ে দিলে শিক্ষকের চেয়ে বড় সহায়ক শিক্ষার্থীদের কাছে আর কী হতে পারে। কিছুদিন শোনা গেল শিক্ষকরা নাকি প্রশ্নপত্র কীভাবে করতে হবে তাই-ই জানে না। এ কথা শোনার পর কীভাবে যে তারা কথাটা মেনে নিল আমার ভাবতে অবাক লাগে। সরকারি প্রাইমারি স্কুলের কথায় বলি আগে। যারা বিএ, এমএ পাস করে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে সঙ্গে আগে-পরে আরও কত ট্রেনিং নিয়ে একজন শিক্ষক প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের পড়াতে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন আর তিনি পারবেন না ওই শিশুদের প্রশ্নপত্র তৈরি করতে; তিনি বুঝবেন না কীভাবে পড়ালে শিশুরা শিখতে পারবে, এ কথা শুনলে মরে যেতে ইচ্ছে করে। আসলে ঘটনা তা নয় সমিতি/কমিটির কাছ থেকে প্রশ্নপত্র কিনে এনে পরীক্ষা নেয়ার মধ্যে একটা লেনদেন আছে তাই ওরা প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারে না। সম্প্রতি এ ব্যাপারে সাংঘাতিক রকমের একটা ভালো আদেশ জারি হয়েছে বলে পত্রিকায়

এসেছে। বলা হয়েছে কেনা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া যাবে না। নিজ নিজ স্কুলের শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র তেরি করে পরীক্ষা নেবেন। এটা বাস্তবায়নে আশা করা যায় কোন গড়িমশি হবে না। শিক্ষক মহোদয়রা স্বতঃসূফর্ত হয়ে এগিয়ে আসবেন এ কাজে।

বলেছি এমন কোন শিক্ষার্থী পাওয়া কঠিন হবে যে কোচিং করে না। আবার এমন কোন শিক্ষার্থীও পাওয়া দুষ্কর হবে যে নোট-গাইডের বাইরে আছে। কোচিংওয়ালারা ওই নোট-গাইড থেকেই পড়ান যে পড়া শুধু পরীক্ষার প্রাকটিস। শেখার জন্য নয়। মূল যে পাঠ্যপুস্তক সেটার আর প্রয়োজন পড়ছে না। ইদানীং গাইড বই এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে দেখলে মনে হবে শিক্ষার্থীর হাতে ওটা বুঝি একটা খাতা। আসলে ওটা একটা গাইড বই কোন এক বিষয়ের। সবক'টা পাঠ্যবই নিয়ে একটা গাইড বই যেমন পাওয়া যায় তেমন আবার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন গাইড বইও পাওয়া যায় যেটা নিয়ে চলাচলে সুবিধা। প্রথম শ্রেণী থেকেই এভাবে আছে ওপরে যতদূর পর্যন্ত আপনি চান। এ অবস্থায় এমন কথা আসতেই পারে যে, কোচিং আর নোট-গাইডই যদি সব হয় তাহলে এ যে, শত শত হাজার কোটি টাকার বিনা মূল্যের পাঠ্যবই কেন। আর কোচিংই যদি সব হয় তাহলে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের অবস্থা কী। অবস্থা যে কী তা নিয়ে বহু লেখালেখি মিটিং-সেমিনার গোলটেবিল বৈঠক হয়েছে, হচ্ছে। দেশ-বিদেশে তার প্রতিবেদনও বেরুচ্ছে যেমন তার একটি

প্রতিবেদনের কথা বলি। এ বছরেরই গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাংক এক প্রতিদেনে বলেছে মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা চার বছর পিছিয়ে আছে। এর মানে আমাদের শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে যা শেখার কথা তা শিখছে পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে। এতে ১১ বছরের স্কুলজীবনের ৪ বছরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটা খুব লক্ষণীয় যে বিশ্বব্যাংকের এ রিপোর্ট নিয়ে এ পর্যন্ত কাউকে কোন উচ্চবাচ্য করতে শোনা গেল না।

আমি একটা কথা নিতান্তই গায়ে পড়ে শিক্ষক মহোদয়দের বলতে চাই। কাজটা শ্রেণীকক্ষে করতে হবে যার সঙ্গে দৃশ্যত পরীক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। যেটা আমরা করেছি বললে বহু পুরান দিনের কথা হয়ে যাবে। আপনারা যারা একটু সিনিযর শিক্ষক আপনারাও করে থাকবেন বলে বোধ করি। সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন বাংলার ক্লাসে বাংলা, ইংরেজির ক্লাসে ইংরেজি ওদের দিয়ে লিখাবেন। বই থেকে বা নিজের মন থেকে বলবেন যত দূর সম্ভব কঠিন শব্দ পরিহার করে ওরা লিখবে। একটা বাক্য দুই বারের বেশি বলবেন না। ১০-১২ মিনিটে কাজটা শেষ করবেন যতটুকু হয়। এর বেশি সময় নিলে পরে খাতা দেখে শেষ করতে পারবেন না। কে কত নির্ভুল লিখতে পারল এ সময় এটা হবে দেখার বিষয়। একজন শিক্ষক নিজ উদ্যোগে এ কাজটা করতে পারেন। সে অধিকার তার আছে। মনে রাখতে হবে, যে যায়-ই করুক-বলুক শেখানোর দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষার মান পড়ে যাওয়ার জন্য যে বদনাম তা শিক্ষকদের দ্বারাই ঘোচাতে হবে।

কর্তৃপক্ষেরও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের লেখানোর এ ব্যাপারটির দিকে। এতে কী লাভ হবে সে ব্যাখ্যায় আর না গেলাম।

নোট-গাইডে সয়লাব দেশ। পাঠককে অনুরোধ করব সম্ভব হলে জেলা শহরের লাইব্রেরি পাড়াটা একবার ঘুরে আসুন দেখে আসুন সেখানের দোকানগুলোতে কী বই পাওয়া যায় কী বই বেচাকেনায় লাইব্রেরিগুলো ব্যস্ত। ওখানে গেলেই নোট-গাইডের চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনার নিজের বাসায় কী অবস্থা লক্ষ করুন। অথবা স্কুল পর্যায়ের যে কোন একজন শিক্ষার্থীর বইপত্র নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে দেখুন সে কী বলে কী বই পড়ে। আর মহানগরীতে যেখানে স্কুল তার আশেপাশেই পেয়ে যাবেন লাইব্রেরি। বইপাড়া বাংলাবাজার যেতে হবে না কষ্ট করে।

আরেকটা বলেছি সহায়ক গ্রন্থের কথা। এখন আর এনিয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন কাজটা ভালোভাবেই সেরে দিয়েছে। খবরটার শিরোনাম ছিল ‘দুই লেখকের চার বই নিয়ে তোড়পাড় : অখ্যাত লেখিকার বই নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় বাণিজ্য’। এতেই দেশের মানুষ জানতে পেরেছে সহায়ক গ্রন্থের নামে কেমন রচিত গ্রন্থ শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। একে শিক্ষা সহায়ক গ্রন্থ নয় বাণিজ্য সহায়ক গ্রন্থ বলব আমি। ওই রিপোর্টে কী বলা হয়েছিল তা এখানে একটু থাকা দরকার। বলা হয়েছিল, অখ্যাত লেখক কুমার সুশান্তের বই ‘অসাম্প্রদায়িক

বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ’ এবং কবি মৌসুমী মৌ’র লেখা তিনটি ছড়াগ্রন্থ ‘জাগরণ আসবেই’, ‘রামছাগলের পাঠশালা’ এবং ‘বাংলা ছেড়ে ভাগ’ নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কেনা হয়েছে। চারটি বইয়ের মোট দুই লাখ কপি সরবরাহ করা হয়েছে যার মূল্য ৭ থেকে ৮ কোটি টাকা’। বইগুলো জায়গা মতো পৌঁছে গেছে এবং ঘটনা হলো ইতোমধ্যে ওইসব বই কেনার নির্দেশনা বাতিলও করা হয়ে গেছে। এই হলো সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক গ্রন্থ সরবরাহের একটা নমুনা মাত্র। এতেই অনুমান করা যায় সহায়ক গ্রন্থের নামে কী চলছে।

অন্যদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট স্কুলগুলো চলছে নার্সারি-প্লে থেকে এককটা একেক শ্রেণী পর্যন্ত দেশের ছোট-বড় শহরগুলোতে এমন কী গ্রামেও সেগুলোর অবস্থা কী। কী পড়াচ্ছে কারা পড়াচ্ছে কীভাবে পরীক্ষা নিচ্ছে কত বার পরীক্ষা নিচ্ছে কতগুলো সহায়ক গ্রন্থ কেনাচ্ছে কোথায় পড়াচ্ছে কতখানি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে পড়াচ্ছে, কখন স্কুল শুরু কখন শেষ কখন কোচিং করাচ্ছে কী রকম ইউনিফর্ম পরাচ্ছে তা দেখার কেউ নেই। সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোর তদারকির জন্য যে বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে তারা সেখানেই হিমসিম খাচ্ছে। কতটুকু মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাহলে ছোট ছোট সোনামণিরা যারা বিরাট একটা সংখ্যায় প্রাইভেট স্কুলগুলোতে পড়ছে তাদের দিকে তাকাবে কে। একটু লেখালেখি করি তার ওপর আবার প্রাথমিক

শিক্ষা অধিদফতরাধীন চাকরি করে এসেছি এসবের সুবাদে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং কারিকুলামের প্রণেতা যারা সেই এনসিটিবির চেয়ারম্যান এবং পরিচালক (কারিকুলাম)-এর সঙ্গে বছর দুই আগে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের শিশুদের যুগোপযোগী লেখাপড়া করাতে যা কিছু প্রয়োজন সবই করতে হবে তবে সেটা করতে হবে কারিকুলামের সঙ্গে সমন্বয় করে নিয়ে। কারিকুলাম অপরিবর্তিত রেখে সহায়ক বইয়ের নামে সেটা করতে গেলে ওদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা হবে। যার ফল ভালো নাও হতে পারে। এ ব্যাপারে এনসিটিবির বক্তব্য হলো, কারিকুলাম তৈরির পরপরই তারা (এনসিটিবি) সার্কুলার মারফত-সংশিষ্ট সবাইকে এ মর্মে জানিয়ে দিয়ে থাকেন যে, বোর্ডের অনুমোদিত বই ব্যতীত অন্য কোন বই স্কুলে পড়ান যাবে না। তারপর সেটা বাস্তবায়ন কতটুকু হচ্ছে বা না হচ্ছে তা মনিটোর করার দায়িত্ব তাদের না। সে দায়িত্ব নিজ নিজ প্রশাসনের অর্থাৎ ডিজি প্রাইমারি এবং ডিজি সেকেন্ডারির। তাছাড়া মনিটোরিং করার মতো লোকবল তাদের নেই। এনজিওরা যে কার্যক্রম চালায় স্কুলগুলোতে সে সম্পর্কে বলেন, এক্ষেত্রেও যা করার করে প্রশাসন। প্রশাসন থেকে এনসিটিবির কাছে পাঠান হলে এনসিটিবি থেকে সেটা দেখে দেয়া হয়। এই মর্মে দেখে দেয়া হয় যে, কারিকুলামের সঙ্গে সেটা যায় কি না বা সাংঘর্ষিক হয় কিনা -এ পর্যন্তই। সে যাহোক,

বলতে চাচ্ছি, প্রাইমারিতে কোচিং সেন্টার, নোটগাইড ও সহায়ক গ্রন্থ নিয়ে এই যেখানে অবস্থা সেখানে শিক্ষা আইনের খসড়া ঠিক হতেই যদি এত সময় লেগে যায় তাহলে সেটা পাস হবে কবে আর বাস্তবায়নই বা হবে কবে। আর এসব দূরইবা হবে কবে।